নিচে নামা

তপন তরফদার

দরদর করে ঘামছে, গলার স্বর এখনও স্বাভাবিক হয়নি। সুভাষ বালিশ থেকে মাথাটা টেনে নিয়ে বসে পড়েছে। ঘরে এয়ারকন্ডিশন চলছে, গরম হওয়ার কথা নয়, তবুও শরীর ঘামছে। দুঃস্বপ্নে আবার দেখা দিয়েছে অনেক বছর আগের ঘটনাটা। সুভাষ নিজের মনেই শূন্যে লাথি মেরে বলত এই সুভাষ নামটি আমায় ডুবিয়েছে। গিভ মি ব্লাড আই উইল গিভ ইউ ফ্রিডম। রক্ত টগ বগ হয়ে ফুটছে, রক্তের লং লাল, আগুনের থেকেও লাল। সে আগুন পুড়িয়ে ছারখার করে দেয়। মানুষের মনের আগুন কেন পুড়িয়ে সব ছার খার করতে পারে না।

ত্রিশ বছর আগে কলেজে ঢুকে ও বুঝতে পারে তার জন্মটাই বৃথা। নামটাতো নিজেকেই ভেংচি করে আর হতাশা বাড়ায়, বাড়ির কেউই চায় না সুভাষ কলেজে ভর্তি হোক। উচ্চমাধ্যমিক ডিঙিয়েছে মানে অনেক উঁচুতে উঠেছে। এবার তার কোন কাজ নিয়ে সংসারের এই ঘানি ঠেলুক সবাইকে সাহায্য করুক। প্রথম সন্তান, পুত্র সন্তান, এর পর পর চার বোন। রামরাজাতলার ঘোষপাড়ার পূজারি ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান সুভাষ ভট্টাচার্য্য। ওদের পূর্বপুরুষ ঘোষ জমিদার বাড়ির পূজারি ছিল। সেই পরিবারই এই শিব মন্দির লাগোয়া দু কামরা ঘরে থাকার বন্দোবস্ত করে দেয়। সুভাষদের দায়িত্ব সকাল সন্ধ্যা নিত্য এই মন্দিরে পূজা করতে হবে। শিব মন্দিরটির গাল ভরা নাম আছে, নাম কৈলাসধাম মন্দির একটা আট ফুট বাই ছয় ফুট একটা স্তম্ভ, চার দিকটা বেলে পাথর দিয়ে বাঁধানো, মাথায় এক চূড়া কবে কে যে করেছিল এখন কিছুই দেখা যায় না। মাঝখানে একটা কালো শিবলিঙ্গ। শিবলিঙ্গটায় কাটা কাটা অনেক দাগ। শিবলিঙ্গেরও নিজস্ব যে আকর্ষণ, যে মাধুর্য থাকে তার কিছুই নেই। চন্দন দিয়ে সাজিয়ে রাখলেও তার কাটা দাগ মেকাপ দেওয়া যায় না। ভক্তরা এই শিব ঠাকুরকে পছন্দ করে না। ভক্তদের ফলমূলে প্রণামীতে ঠাকুর যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হবে, ঠাকুরের উপর ভর করে আমরা যে কিছু পাব, তা হয়ে উঠে না। দু একজন প্রাচীন ভক্ত পূজা দিতে আসে, নতুন প্রজন্মের কেউই এই মন্দিরের ছায়া মাড়ায় না। গঙ্গার ধারে নতুন মার্বেল পাথরের নয়নাভিরাম শিব এবং পার্বতীর মূর্ত্তি দেওয়া মন্দির। পূজারি কাশীধামের বংশধর। ওই মন্দিরের পৃষ্ঠপোষক বিখ্যাত কেজরীওয়ালা। কলকাতায় দুটো ফুটবল টিম একটা ক্রিকেট টিম কিনে রেখেছে। এখানে এই মন্দিরটাও একরকম ওনার ব্যবসার অন্যতম পীঠস্থান। মন্দিরটা তৈরী করেছিলো ভূষণ কেজরীওয়ালা, এই গঙ্গা কেজরীওয়ালার বাবা, নিজের মায়ের স্মৃতিহিসাবে এই মন্দির। তখন মন্দির মন্দির অনুযায়ী চলত, এখন বারো মাসে তের পার্বণ, প্রত্যেক পার্বণে প্রচুর দর্শনার্থী, দেদার পূজা, অগুণতি প্রণামী। প্রণামীর কাঁচের বাক্স ভর্তি প্রতিদিনই। সুভাষের নিজেরই নিজেদের মন্দির ভাল লাগে না। গঙ্গার ধারে ফুরফুরে হাওয়া কত লোক জন। আস্তে আস্তে যখন সূর্য ডুবে যায় আকাশের রং আকাশি থেকে হালকা হলুদ হয়ে গোলাপি ছটা ছিটিয়ে আস্তে আস্তে অন্ধকার হয়ে যায়। গঙ্গার আকাশে নানা রকম পাখি ডানা মেলে নিজেদের বাসায় ফিরে যায়। গঙ্গার ধারে অশ্বথ গাছটায় কিচির মিচির শব্দ এক অন্য অনুভূতি এনে দেয়। মন্দিরের ঢোকার গেটে চায়ের দোকান, ফুচকাওয়ালা, ঘুগনিওয়ালা এমনকি চাউমিনের দোকান আছে। পূজা দিতে এসে, ঠাকুর দেখতে এসে অনেকেই এখন খাবার দাওয়াকেও পূজার অঙ্গ হিসাবে দেখে। রথ দেখা আর কলা বেচা এক সঙ্গেই চলে। সুভাষদের সেই ভাঙাচোরা একটা এক কামরার মন্দিরের শিবলিঙ্গ, একাই পড়ে থাকে। সুভাষের বাবা সকাল বেলায় পূজা করে আরতি করে কয়েকটা নকুল দানা নিয়মিত যোগাড় করতেই বেগ পেতে হয়। বাবা কয়েকটা ঘরে পূজা করার জন্য ডাক পায়। কয়েক ঘরের যজমানি এখনও ধরা আছে। কিন্তু তাদের কাছ থেকে প্রাপ্তি খুবই নগণ্য। ব্রাহ্মণ মানুষ সমাজের উচ্চ সম্প্রদায়ের লোক হওয়ার জন্য, অন্য কোন কাজ মান সম্মানের সঙ্গে আপোষ করে এখন দোকানে দোকানে গণেশের পূজা করেন। কিছু আয় হয়। দু বেলা খাবারের সংস্থান কোনরকমের হয়। কিন্তু সংসারের অন্যকিছু হয় না। এই অবস্থায় লেখাপড়া চালিয়ে যাওয়া এক দুঃসাধ্য ব্যাপার। বাবা বা পরিবারের কেউ চায় না, সুভাষ লেখাপড়া চালিয়ে যাক। বাবা অন্য কাজ না শিখে যা ভুল করেছে ছেলেকে সে ভুল করাতে চান না। গাড়ি মেকানিক বা লেদের কাজ শিখুক। সুভাষ বলে নিজের পড়াশুনার খরচ নিজেই জোগাড় করে নেবে। টিউশনি করে কলেজের খরচ যোগাবে। সকালে সন্ধ্যে মুখের রক্ত তুলে ছেলে পড়িয়ে যায়। কলেজের খরচ যোগাড় হয়ে যায় কিছু টাকা মাকেও সংসারের সাহায্যের জন্য দেয়। সুভাষের ভাগ্য ভাল এক এম এলএ সাহেবের বাড়িতে উনার মেয়েকে পড়াবার সুযোগ পেয়েছে। একদিন এমএলএ সাহেব সিধে পড়ার ঘরে হাজির। মেয়ের পড়াশুনার খোঁজ নেয়, সুভাষকে বলে পড়িয়ে যাও, তুমি পাশ কর তোমাকে কোন চাকরিতে ঢুকিয়ে দেবো।

সুভাষ মন দিয়ে টিউশনিই করে যায় টাইপ করা শেখে। নিজের পড়া আর তেমন করতে পারে না। পরীক্ষার প্রশ্নপত্র পড়ে বুঝতে পারে, অপরকেই পড়িয়েছে নিজে পিছিয়ে পড়েছে। পরীক্ষার ফল ভাল হল না। সুভাষ ফেল করল। এদিকে টিউশনির বাজারে ধস নেমে যায়। অভিভাকরা বলতে থাকে যে মাস্টার নিজেই পাশ করে না, সে ছাত্রদের কিভাবে পাশ করাবে। অভিভাকদের মনেই আসে না, ক্লাস ফোর ফাইভের ছেলে মেয়েকে পড়াতে বি.এ. পাশের কোন দরকার হয় না। টিউশনির বাজার এরকমই। সুনাম। মাস্টারের সুনামের উপরই টিউশনির বাজার নির্ভর করে। সুভাষ এই বাস্তবের ধাক্কায় নাজেহাল হয়ে যায়। টিউশনির বাজারে প্রায় বন্ধ। বাড়িতে যে কয়েকটা টাকা দিয়ে সাহায্য করত তাও বন্ধ। বাড়ির পরিবেশ পাল্টে যায়। সংসারের সমস্ত অঘটনের জন্য যেন সুভাষই দায়ী। এম এল এ সাহেবের মেয়ে উঁচু ক্লাসে উঠে গেছে। ওখানে টিউশনিতে রাখবে না। পরীক্ষায় পাশও করতে পারেনি যে চাকরির জন্য বলবে কি করে। অনেক দ্বিধা দ্বন্দ্বের মধ্যে বলেই ফেলল চাকরির কথা। এম এল এ সাহেব বলেন—তুমি তো বি.এ.ও পাশ করলে না যে কোন আধা সরকারি জায়গায় লাগিয়ে দেবো। ঠিক আছে দেখছি কি করা যায়। পনেরো দিন পরে এসো।

২৫/২ যমুনালাল স্ট্রিট, বড়বাজার। খেংরা পট্টির ভিতর দিয়ে গলি তস্য গলির ভিতরে অন্ধকার বড় বড় ধাপের সিঁড়ি পেরিয়ে তিন তলার হুমান কটন লিমিটেড। মেঝে থেকে এক ফুট উঁচু চৌকিতে সাদা গদি পাতা। বড় ক্যাশ বাক্সের উপর সাদা খাতা লিখে যাচ্ছে একমনে একজন। কুলুঙ্গিতে গণেশের মূর্ত্তি। ইলেকট্রিকের নানা রঙের সরু বালবগুলো জ্বলছে নিভছে। এম এল এ সাহেবের চিঠিটা হাতে নিয়ে উনাকে

বললাম আমি গণপতলাল খেমকার সঙ্গে দেখা করতে চাই। কম করে তিন চার দিন দাড়ি না কামান মুখ, চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা, মাথার সামনেটায় কাঁচা পাকা চুল জট লেগে একটা ঝুটির মতো হয়ে রয়েছে। মাঝখানটা ফাঁকা যদিও টাক নয়। গায়ে সুতির হাফ হাতা ঘিয়ে রঙের শার্ট, পরনে ফুল প্যান্ট। বাবু হয়ে বসে ছিল, পা-দুটোর জায়গা বদল করে নিয়ে, সুভাষের দিকে তাকিয়ে বলল– কি দরকার।

–আমি জয়ন্ত সিকদার, এম এলএ পাঠিয়েছে।

–তাতো বুঝলাম। কিন্তু কেন। কিসের জন্য চাঁদা।

–না না আমি চাঁদা চাইতে আসি নি আমি–কথা শেষ করার আগেই ফোনটা বেজে উঠল। এতক্ষণ লক্ষ করিনি তাকিয়ার পিছন দিকে একদম দেওয়াল ঘেঁষে একট কাঠের বাক্সের ভিতর থেকে ফোন বাজছে। লোকটা ফোন ধরে দুলালবাবু বলছি বলেই–হ্যাঁ-জী-হ্যাঁ-জী বলার পর বলল, বাবুজী আপনার সঙ্গে একজন দেখা করতে চায়। কোন এম. এল এর চিঠি এনেছে। লোকটা ফোনটা নামিয়ে রেখে বলল, পাঁচ তলায় চলে যান। পাঁচ তলা আসতে গিয়ে নরক দর্শন হয়ে যায়। এত অন্ধকার। সিঁড়িগুলো খয়ে গেছে। দেওয়ালের ইটগুলো দিয়ে সুরকি ঝরছে। ঘন কালো ঝুল। তার মাঝখানে, বাড়ান সিঁড়ির ল্যান্ডিং-এর এক কোণে একটা ভাঙা টিনের দরজা ঝুলছে। আবছা অন্ধকার দুটো সিমেন্টের বড় বড় পাদানি। সিমেন্ট দিয়ে বাঁধানো হয়েছিল কবে কে জানে। তবে কেউ আর পাদানি পর্যন্ত যায় না, তার আগেই তাদের কাজ সেরে চলে যাচ্ছে। দুর্গন্ধ মাপার কোনো যন্ত্র আছে কিনা সুভাষ জানে না। শব্দ মাপারও যন্ত্র-র নাম শুনেছে কিন্তু দুর্গন্ধ মাপার যন্ত্রের নাম জানে না। পৃথিবীর সব থেকে দুর্গন্ধময় জায়গা হয়ত এটাই। সুভাষ অবাক হয়ে যায় কারও কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই। সবাই যাতায়াত করছে। দারিদ্রের সঙ্গে প্রতি নিয়ত পরিচয় হয়েছে, কিন্তু এই দুর্গন্ধময় পরিবেশের সঙ্গে কখনও পরিচিত হয়নি। সুভাষ নাকে রুমাল দিয়ে এগাতেই দুলাল বাবু বলে, প্রথম প্রথম আমারও ঘেন্না লাগত আস্তে আস্তে সব সয়ে গেছে। আপনি চাঁদা চাইতে নয়, তবে কিসের জন্য এসেছেন।

–আমি একটা চাকরির সন্ধানে এসেছি। কথাটা শুনেই দুলাল বাবুর মুখটা কেমন যেন ফ্যাকাশে হয়ে উঠল। চোখটা কেমন নিস্তেজ দেখাল, মুহূর্তের মধ্যেই নিজেই সামলে নিয়ে বলে–আপনি ইয়াং ছেলে এই মারোয়ারি গদিতে কাজ করে পোষাবে আপনার! আমার কোনো গতি নেই বলে এখানে পড়ে আছি। এরা যা খাটায় যা অভদ্র ব্যবহার করে চিন্তা করা যায় না। সুভাষ কোনো কথা না বলে এগোতে থাকে মনে মনে বলে, খাটব বলেই তো এসেছি।

মনে মনে গণপতলাল খেমকার যা ছবি এঁকেছিলাম তার সঙ্গে মিল নেই। মাঝ বয়সি ব্লু রংয়ের স্যাফারি স্যুট পরা এক ভদ্রলোক কম্পিউটারের মাউসে হাত চালিয়ে কম্পিউটারে কাজ করে যাচ্ছে। মাথার চুল দামি কলপ দিয়ে কলপ করা বলে কারোর একটা আলো ঠিকরে পড়ছে। বাটারফ্লাই গোঁফ। ঠোঁটে পানের রস লেগে রয়েছে। এই পানের রসই বলে দিচ্ছে, স্মার্ট সেজেছে, জাত স্মার্ট নয়। আমার দিকে তাকিয়ে পরিস্কার বাংলাতেই বললেন– এম এল এ বাবু পাঠিয়েছেন। ঠিক আছে, কাজে লেগে যাও। আমি একজন ভাল কাজের লোক খুঁজছি। পরিস্কার বাংলা, কোনো মারোয়াড়ির টান নেই। আমি অবাক হয়ে গেলাম। সাধারণত এরা বাংলা বলে, কিন্তু বাংলার উচ্চারণেই বুঝিয়ে দেয় বাঙালি নয়। এবং এই সময়েই বুঝিয়ে দেয় এরা ব্যওসা ছাড়া আর কিছুই বুঝে না। বুঝতে চায় না। এত সুন্দর বাংলা কথা শুনে গণপতজির চাউনি দেখে এবং সরাসরি রাখঢাক না রেখে কথা বলার জন্য আমার ভাল লাগল। অবশ্য সব থেকে ভাল লাগল আমার কাজের কথাটা শুনে। বুক ছলাৎ করে উঠল। হৃদপিন্ডের ধুকপুক আওয়াজ আমি শুনতে পাচ্ছি, চোখ দিয়ে কি জানি কি করে জল বেরিয়ে আসল, আমি একটু হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলাম, গণপতিজি জোরেই বলে উঠল সব কাজ পারবে তো।

–নিশ্চয়ই পারব। যা বলবেন তাই করব।

–যাও নিচে গিয়ে দুলাল বাবুর কাছ থেকে কাজ বুঝে নাও, আজ থেকে কাজে লেগে যাও।

আবার সেই সিঁড়ি বেয়ে নিয়ে নামতে লাগলাম। উঠার সময় মানুষের যা কষ্ট করতে হয়, নামার সময় মনে হয় কোন কষ্টই করতে হয় না। মানুষ নিচে হড়হড় করে নেমে যায়। এখন সিঁড়ি দিয়ে নামতে আমি কোন খারাপ দৃশ্য দেখতে পেলাম না। মনে উল্লাস, তাই কোন দুর্গন্ধও পেলাম না। অবিশ্বাস্য দ্রুততায় এক নিশ্বাসে দুলাল বাবুর কাছে এসে বললাম কি কাজ করতে হবে বলুন, দুলাল বাবু মুখটা তুলে ঘোলাটে চোখে বলে– কি কাজ তুমি জান।

–আমি তো কোন দিন অফিসে কাজ করিনি। কিছুই জানি না। আমাকে দেখিয়ে দিলে নিশ্চয়ই পারব। দুলাল বাবুর মুখে একটা ঝিলিক খেলে গেল। আমাকে বলল– ইয়ং ছেলে তুমি, তোমার ভবিষ্যৎ আছে এখানে এসে নিজের জীবন কেন বরবাদ করবে। এর আগে চার পাঁচ জন এদের বদ ব্যবহার সহ্য না করতে পেরে চলে গেছে। আমার নেহাত উপায় নেই পড়ে আছি। আরও কথা বলে যেতে লাগল কোন কাজ না দিয়ে অকাজের কথাই বেশি হয়ে যাচ্ছে। আমি আবার বললাম কি করতে হবে– দুলাল বাবু বলে টাকা গুনতে হবে। টাকা গুনেছোতো কোন দিন–

–আমি ঘাড় দুলিয়ে বলি পারি। দুলালবাবু দেওয়ালে লাগানো সিন্দুকের থেকে কয়েক তাড়া নোট বার করে দিয়ে বলে একশো পিস টাকার এক একটা প্যাকেট করে গার্ডার লাগিয়ে দাও। বাটি ভর্তি গার্ডার আর নোটের তাড়াটা ফরাসের উপর রাখে। একসঙ্গে এত টাকা দেখেই শরীরে একটা ভয় ভয় ভাব খেলে গেল। খুব যত্ন করে নোটের পাশে বসে গুনতে শুরু করলাম। দশ বারটার বেশি নোট একসঙ্গে কোনদিন গুনি নি। একটা নোটের সঙ্গে আর একটা নোট লেগে যাচ্ছে। ঠিকমত না গুনতে পারবে বিপদ। আমি বললাম একটা জলের স্পঞ্জ পেলে ভাল হত, সুবিধা হত নোট গুনতে।

–মুখের জিভ কি করতে আছে। জিভে আঙুল বুলিয়ে গুনে ফেল। গাটা ঘিন ঘিন করে উঠল। অন্য জনকে থুতু দিয়ে টাকা গুনতে দেখলেই গাটা জ্বলে উঠত। ওর থুতু দেওয়া নোট অন্য লোকের কাছে যাবে। কি করা যাবে, নোটগুলো ঠিকমত গুনতেই হবে। আমি আপ্রাণ চেষ্টা করি। তিন প্যাকেট গোনার পরই দেখি আঙুল গুলো ব্যথা করছে, আর গুনতে পারছি না নিজেকেই বললাম পারতেই হবে। ব্যথা উপেক্ষা করে গুনেই চলেছি। দশটা প্যাকেট হল, পাঁচটা নোট বেশি হল। আমি ভাবলাম আমাকে পরীক্ষা করছিল এই পাঁচটা নোট বেশি, ধরতে পারি কিনা। আমি

বেশ গর্বের সঙ্গে বললাম– এই নিন পাঁচশো টাকা বেশি আছে। দুলাল বাবু কিছু না বলে ফোনে ডায়াল ঘোরাতে লাগল– ফোনে বলল। বুবুজী, টাকাটা এই মাত্র গুনে উঠল। পাঁচশো টাকা বেশি দেখিয়েছে। ওপাশ থেকে কি বলল শুনতে পেলাম না। দুলাল বাবু আমাকে বলল– বাবুজী আপনাকে ডাকছে আপনি উপরে যান। আমি ফরাস থেকে উঠে দাঁড়িয়ে চটিটা পরে ঘরের বাইরে আসলাম। ঘরের পর্দাটা টানতে গিয়ে উঁকি মেরে দেখি দুলাল বাবু ওই দশ প্যাকেট নোট, দেওয়াল আলমারিতে তুলে রাখছে আর পাঁচশো টাকা প্যান্টের পকেটে ঢুকিয়ে রাখল। আমি কি করব কি বলব ভাবতে ভাবতে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠছি। সেই জায়গায় এসে মনে হল আমার তলপেট ও ভারি হয়ে গেছে। আমি দিব্যি পাদানি থেকে দুরে দাঁড়িয়ে, কানে পৈতে না জড়িয়েই তলপেট খারি করে দিলাম। কি মুক্তি। মনের আনন্দে সিঁড়ি টপকাতে টপকাতে মালিকের দরজা খুলে মালিকের মুখোমুখি হলাম।

গনপতলাল তখনও মাউস দিয়ে কম্পিউটারের কাজ করে যাচ্ছে। এখানে মালিককে বাবুজী বলতে হয়। স্যার নয়। কি জানি কেন এই ব্যবস্থা। বাবুজী সম্বোধন সব সময়ই মনে করিয়ে দেবে, 'মনে রেখো আমি তোমার মালিক'। গণপতলাল এর সামনে দাঁড়িয়েই আছি উনি খেয়াল করেছেন না, কি জানি কেন, আমি দুবার বাবুজী বলেছি তাও, আবার বাবুজী বলে ডাকতেও পারছি না, নিশ্চয়ই উনি কম্পিউটারে গুরুত্বপূর্ণ কোন কাজ করছেন, আমি দাঁড়িয়ে আছি। মাউসের ক্লিকটা হাতের আঙুল দিয়ে বেশ শক্ত করে ক্লিক করে এক অদ্ভুত হাসি দিলেন। হাসতে গিয়েই চোখটা আমার দিকে ঘুরে গেল। হাসি বন্ধ করে বলল–কি কাজ করাবে। সামান্য টাকা ঠিকমত গুনতে পারো না। এতক্ষণ সময় দিয়ে টাকা গুনলে তাও ভুল। মাত্র একলাখ টাকা গুনতে দিন কাবার হয়ে গেলো অন্য কাজ কি করবে। আমি মুখ নিচু করে বললাম– ঠিক পারব স্যার। প্রথম দিনতো তাই ভুল হয়ে গেছে।

–ঠিক আছে, দুলালবাবুর কাছে যাও। এটা সরকারি অফিস নয়। আমার গদি, যখন ইচ্ছা ঘাড় ধরে বার করে দেবো। যাও। মুখ নিচু করে বাইরে আসি। চোখের কোণে জল। আঙুল টনটন করছে। এত মন দিয়ে গুনলাম তাও ভুল। হতে পারে। তবু একটা ভাল মুখ করে তো বলতে পারত ভাল ভাবে গুনো। পা দুটো যেন অবশ হয়ে গেছে, সিঁড়ি ধরে আস্তে আস্তে নামছি। চাকরি করতে আসছি শুনে বাড়ির সবারই সে কি আনন্দ। গত এক মাসের সব অবহেলা অযত্ন একদিনেই উধাও হয়ে গেছে। মা কোথা থেকে একটা প্লাস্টিক টিফিন কৌটো যোগাড় করে ঠাকুরের পূজোয় কলা, আপেল দিয়ে গিয়েছিলো সেটাই যত্ন করে কেটে দিয়েছে আমি টিফিনে খাব বলে। আর একধাপ সিঁড়ি পা দিয়েই বাবার মুখটা ভেসে উঠল। পৈতেটা নিয়ে কথায় কথায় লোকে আশীর্বাদ করে উঠেন– শুভায়ু ভবতু বাবাকে নমস্কার করে বাড়ি থেকে এখানে বাবার সেই প্রসন্ন মুখটা ভেসে উঠল। নিজে জীবনে কিছু পারেন নি, ছেলে যেন পারে। এই যে পারা না পারার গন্ডি ডিঙিয়ে অন্য জগতে পা রাখছে নিজের বংশধর সেই উৎফুল্লতা কি একদিনেই ফানুস হয়ে উড়ে যাবে। বোনদের মরা মাছের মত চোখের চাউনির বদলে যে জীবন্ত ঝিলিক দেখেছি সে কি চিরতরে হারিয়ে যাবে। সিঁড়ির ধাপ ভেঙে পা বাড়িয়ে সেই সিঁড়ির খাঁজে চলে এসেছি। মনে হল তলপেট ভরে গেছে। যান্ত্রিক মানুষের মত দাঁড়িয়ে পড়লাম। কোন গন্ধ নাকে লাগল না। আবার নিচে নামতে লাগলাম।

দুলালবাবু দরজার দিকেই তাকিয়ে বসে ছিলেন। ক্যাশ বাক্সের উপর আঙুল দিয়ে কুড় কুড় আওয়াজ তুলছিলেন। বেশ জোরে জোরে ডান হাতে আঙুল দিয়ে কুড় কুড় আওয়াজ তুলে আমার মুখের দিকে মুখ রেখে চোখ টিপে জিজ্ঞাসা করল–বাবুজী কি বলল।

আমি সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে আমার পৈতে ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করেছি আমি রাগবো না। যত নিচু হতে হয় হব, যত নিচু নামতে হয় নামব। যত অপমান করে করুক আমি সহ্য করে যাবো। আমার বাড়ির লোকজনের চোখ আবার নিস্প্রভ হতে দেব না।

লোকে বলে গাধার মত খাটতে কেউ পারে না। সুভাষ বলে আমার মত কেউ খাটতে পারে না, গাধা একান্তই শিশু। মানুষ যে এত খাটাতে পারে সুভাষের কল্পনাতেই আসেনি কোন দিন। নিজের খাটে এতো দূর অস্ত। কিন্তু সুভাষ নিজেকে দিয়ে বুঝেছে, মানুষ কি না করতে পারে। প্রতিজ্ঞা করেছে কাজ করে যাব। সকাল নটায় গদিতে বসে রাত নটা পর্যন্ত এক নাগাড়ে ওকে দিয়ে নোট গানায়, ব্যবসার তাগাদায় পাঠায়, এক মুহূর্তেও বিশ্রাম দেয় না। রাত্রে বাড়ি ফেরার সময় দুলালবাবু সুভাষকে বলে এত খাটনি মোর পোষাচ্ছে! তোমার ভবিষ্যৎ তুমি নিজে নষ্ট করছ। সুভাষ কিছুই বলে না। কিছুদিনের মধ্যেই সুভাষ জেনে যায় গণপত বাবুজী একজন অসুখী লোক। উনার স্ত্রী একজন বেঢপ মোটা মহিলা, বাতের রুগি। রুগ্ন হয়ে, বিছানায় পড়ে থাকে, গণপতদের পরিবারে কলকাতায় অনেকদিন আছে, গণপত এই মেয়েকে বিয়ে করতে চায়নি। কিন্তু ব্যবসার গাঁট বন্ধন শক্ত করার জন্যই পরিবারের ঠিক করা মেয়েকে বিয়ে করতে বাধ্য হয়। ব্যবসার কিছুই দেখে না, নামকা ওয়াস্তে অফিসে এসে কম্পিউটারে গেমস্ নোংরা ছবি দেখে। সন্ধ্যাতে বাঁধা মেয়ে মানুষের ফ্ল্যাটে যায়। দুলাল বাবুই ব্যবসার সব কিছু দেখাশুনা করে। বিয়ের বিনিময়ে সরকারের ঘর থেকে পাওয়া তুলোর ব্যবসায় লাইসেন্সটা গণপতের পরিবার পেয়েছে। সরকারী ভূর্তকিতে এক নম্বর -তুলা কম দানে কেনার সুযোগ পেয়েছে এই লাইসেন্সের বলে, সররাচরে কেউ এই লাইসেন্স পায় না।

অনেক পার্টির কাছ থেকে যা টাকা পায় তার থেকে কমিয়েই খাতায় লেখে। দুলাল বাবুর অনেক কিছু বেনিয়ম সুভাষের চোখে লাগল। সুভাষ বুঝতে পারে এতদিন একাই এক হাতে পুকুর চুরি করে যাচ্ছে, অন্যলোক থাকলে অসুবিধা হবে তাই ওকে সরাবার জন্য সব সময়ে সচেষ্ট। সেই পাঁচশো টাকা বেশি ছিল না, দুলাল বাবু ইচ্ছা করে রেখে দিয়েছিলো, এই চিন্তায় কয়েক দিন ওকে কুরে কুরে খেয়েছিল। এখন বুঝতে পারছে তার গোনা সেদিন ঠিকই ছিল। মাস খানেক হয়েছে। সুভাষ নিজেকে খাপ খাইয়ে নিয়েছে। আগের জীবন ভুলতে বসেছে, রাত কখন হয় কি ভাবে হয় তাও ভুলে গেছে। দিন রাত এক করে ব্যবহার টাকা, কোথা থেকে আসে টাকা কোথায় দিতে হয়। সব কিছু জেনেছে। এখন এক রকম দুলালবাবু ছাড়াই নিজেই নিজেই সব কাজ চালিয়ে নিতে পারে।

টিকিয়াপাড়ার ট্রেনটা আটকে গেল। সুভাষ ট্রেনে হাঁসফাঁস করছে। ছাড়বে ছাড়বে করে এক ঘন্টা সময় নিয়ে নিল। অন্যদিন ট্রেন থেকে নেমে হেঁটেই বড়বাজার যায়। আজ বাস ধরল তাড়াতাড়ি যাবে। হাওড়া ব্রিজে জ্যাম। বাস থেকে নেমে হাঁটতে শুরু করল, হাঁফাতে হাঁফাতে গতিতে এসে পৌঁছল তখন সাড়ে দশটা বেজে গেছে। পর্দার ফাঁক থেকে শুনতে পায় দুলালবাবু বলছে, এই ছেলে ছোকরা দিয়ে বাবুজী অফিস

চলে না, এখনও কাজে আসে নি, টাকা গুনতে দিয়ে সব সময় বসে থাকতে হয়, কখন টাকা সরিয়ে ফেলবে কে জানে। ওপাশ থেকে কি বলছে কে জানে। সুভাষ দরজার সামনে থমকে দাঁড়িয়ে যায়। একটু পরে ঘরে ঢোকে। ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই দুলালবাবু বলে বাবুজী তোমাকে ডাকছে, উপরে যাও। বাবুজীর ঘরে ঢুকে দেখে, গণপতজি সেই কম্পিউটারেই মুখ চোখ ঢুকিয়ে আছে। সুভাষ বাবুজী বলতেই—সুভাসের দিকে তাখিয বলে, 'ঠিক সময়ে এসো।' বলেই আবার কম্পিউটারে ডুবে যায়। সুভাষ নিচে আসতেই দুলাল বাবু বার বার জিজ্ঞাসা করে বাবুজী কি বলল, সুভাষ বলে, 'না, কিছু নয়।'

—কিছু নয় বলেই হবে। দুলালবাবু বার বার খোঁচা দেয়, জানতে চায় কি বলেছে। সুভাষ দুলালবাবুর মনের সাধ বুঝে গেছে। দুলালবাবুকে খুশি করতে বলে ওঠে, 'আমি আর এই অফিসে কাজ করব না।' দুলালবাবুর মুখটা হাসিতে ভরে যায়। সুভাষ বুঝে গেছে দুলালবাবু এই অফিসে ওকে কাজ করতে দেবে না। যে কোন ছুতোয় ওকে তাড়াবে। দুলালবাবুর দু নম্বর কীর্তির কিছু খোঁজ পেয়ে গেছে সেটাই আবার গোদের উপর বিষ ফোঁড়া হয়ে গেছে। মালিক বিজনেস নিয়ে মাথায় ঘামায় না, ও নিজেই পাঁকে ডুবতে সুরু করেছে, যে দিন লালবাতি জ্বলবে সেদিন বুঝবে। তবে এই বিজনেসে লালবাতি জ্বলবে না যতদিন গভর্মেন্ট থেকে সরকরি লাইসেন্সের দৌলতে কম পয়সায় মাল পাবে। ওই মাল গুলোই তো অন্যদের চড়া দামে বিক্রি করেই লাভ হয়। সুভাষ নিজের মনেই ভাবতে থাকে কি করা যায়। কেউটে সাপের সঙ্গে বসবাস করা কি সংঘাতিক ব্যাপার। দুলালবাবু ছোবল দেবেই। মালিককে বললেও বিশ্বাস করবে না। আমাকেই তাড়িয়ে দেবে, কয়েকদিন দেখে, কয়েকদিন ধরে গভীর চিন্তা ভাবনায় ডুবে যায় সুভাষ। কি করবে। ডু আর ডাই। ডাই। হ্যাঁ মৃত্যুই একজনকে সরিয়ে দিতে পারে। ডু এর অর্থ কি? ডাই এর অর্থ কি। সুভাষ নিজের মনে বার বার ঝালিয়ে নিল। হাত মুঠো করে নিজেই বলে উঠে 'ডু আর ডাই'।

কয়েকদিন অপেক্ষা করার পর টিপ টিপ করে বৃষ্টি হয়েছে, আকাশে মেঘলা কয়েক ঘন্টার মধ্যে জল ঝড়ের গতিবেগ বেড়ে যাবে। গণপতলাল চলে গেছে। পাঁচ তলার অফিসেই দুজনে বসে কাজ করছে। সুভাষ বলে, দুলালবাবু রাত তো অনেক হল প্রায় আটটা বাজতে যায়। এই বাড়ির সবাই প্রায় চলে গেছে। ঝড় বৃষ্টি নামছে, আমি যদি একটু আগে চলে যাই—

—না না আগে যাবে কেন। আমরা এক সঙ্গে যাব। নিজের ফোলিও ব্যাগটা বগলদাবা করে বলে তুমি লাইট নিবিয়ে তালা দিয়ে বাড়ি যাও আমি এগোচ্ছি। সুভাষ তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করে। দুলালবাবু পাঁচ থেকে চার, চার থেকে তিন তলার সেই দুর্গন্ধময় ল্যান্ডিং এ, সুভাষ বিড়ালের মত নামছে। তিন তলার থেকে একদম নিচে পর্যন্ত সিঁড়ির টিম টিনে আলো জ্বলছে না। দুলালবাবু সিঁড়ির ল্যান্ডিং-এ পা দিতেই কলার খোসায় পা পিছলে যায়। সিঁড়ির হাতলটা ধরে টাল সামলাতে থাকে। পিছনে সুভাষ অন্ধকারেই বুঝতে পারে দুলাল বাবু পড়ে যায়নি, টাল সামলাচ্ছে। উপরের সিঁড়ি থেকে দুরন্ত বেগে পিছনদিক থেকেই পা চালায়। হাতল ঠিকরে সিঁড়ি দিয়ে চিৎকার করাত করতে দুলালবাবু গড়িয়েই যায়, গড়িয়েই যায়, নিচে নামতে থাকে নিচেই নামতে থাকে। সুভাষ একটু দম নেয়। অন্ধকার। আর্তচিৎকার থেমে গেছে মনে হচ্ছে একেবাড়ে সিঁড়ির চাতালেই পৌঁছে গেছে। নিচে নামতে বেশি সময় লাগে না। দুলালবাবুরও সময় লাগল না।

পরের দিন খবরের কাগজে খবর হল সিঁড়ি থেকে পা পিছলে বড়বাজারের হনুমান ট্রেডিং-এর কর্মচারীর মৃত্যু হয়েছে। সুভাষ কালের নিয়ম অনুযায়ী নিজেকে গুছিয়ে নিয়েছে। হনুমান কটন মিল ছেড়ে নিজেই বড় বাজারে কাট-পিস কাপড়ের হোল সেল-এজেন্ট হয়েছে। নিজের মন ভোলানো বাড়িতেই শুয়ে রয়েছে। মাঝে মাঝে ওই লাথির ছবিটা ভেসে উঠে। আজও ঘুমের ঘোরে ছবিটা ভেসে উঠে আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে। ঘুরে ফিরে মনে পড়ে যায়, 'পাপ বাপকেও ছাড়ে না।' দর দর করে ঘাম ঝরছে। স্ট্রোক হয়ে যায় নি তো।